# প্রতিকূল স্রোতে রওশন আরা

## মাহমুদুল হক ফয়েজ

হতাশার গভীর গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতেই রওশন আরা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। কুমিলার লাকসাম থানা পেরিয়ে ইউনিয়নের এক অজ পাড়া গাঁয়ের মেয়ে রওশন আরা। বাবা ছিলেন দিন মজুর। সারাদিন গতর খেটে সংসার চালানো ছিলো প্রায় অসম্ভব। পুতুল-খেলা শেষ হওয়ার আগেই পঁচিশ বয়সী এক জুতা কারখানার শ্রমিক আব্দুস সাত্তারের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন বাপ-মা। স্বামীর সংসারে গিয়ে ছোট্র মেয়েটির উপর পড়লো রাজ্যের বোঝা। এর মধ্যেই বিয়ের এক বছরের মাথায় কিশোরী রওশনের গর্ভে জন্ম নিল তার প্রথম সন্তান। কিন্তু অপরিপক্ক বয়সে মা হয়ে আরো রুগ্ন হয়ে পড়লো। শিশুটিও ছিলো রুগ্ন। জন্মের কয়দিন পরেই সন্তানটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এভাবে পর পর আরো তিনটি শিশু জন্ম হলো রওশন আরার গর্ভে কিন্তু বাঁচলো না একটিও। দেখতে দেখতে ছয়টি বছর কেটে গেলো। পর পর চারটি সন্–ানের জন্ম দিয়ে একটিও না বাঁচাতে পারায় শ্বশুর বাড়ীর সমস্ত অপবাদ, দোষ-ত্রুটি এসে পড়লো তার উপর। অপয়া অলক্ষী অপবাদ নিয়ে রওশন আরা ফিরে আসলো বাপের বাড়ী। তখন তার গর্ভে দুই মাসের সন্তান। বাবার কষ্টের সংসারে একদিকে শারীরিক আর অন্যদিকে নিদারুণ মানসিক যন্এণায় তার দিন কাটতে লাগলো। ১৯৮৪ সালের চৈত্রের এক দুপুরে রওশন আরার ঘরে পঞ্চমবারের মত জন্ম নিল এক কন্যা সন্তান। কন্যা শিশুর জন্মে বাবা-মা খুশীই হলেন। তবু বাবার অভাবী সংসারে নিজেকে বোঝা মনে হলো তার। বাবার বোঝা না হয়ে একটা কিছু করার ইচছা পোষণ করতে লাগলেন তিনি।

এ সময় গ্রামে ‘স্বনির্ভর’ নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্মী হিসাবে চাকরী নিলেন। বেতন মাত্র ৪০০ টাকা, কিন্তু এত অল্প পয়সায় তার খরচ চলছিলো না। এ সময় গ্রামে আনসার-ভিডিপির কার্যক্রম শুরু হয়। রওশন আরা মাত্র ১২০ টাকা মাসোহারায় আনসার-ভিডিপি সদস্য হিসাবে কাজে যোগ দেন। ঠিক এ সময় তার স্বামী দীর্ঘ চার বছর পর রওশনকে আবার নিয়ে যান। ১৯৮৭ সালে রওশন ষষ্ঠ বারের মতো মা হলেন। ইতিমধ্যে স্বামী চাইছিলেন না তার স্এী বাইরে চাকুরী করুক। স্বামীর বাড়ীর লোকরাও আপত্তি করছিলো। রওশন চাকরী ছেড়ে দিলেন। ইতিমধ্যে তার কাছে চাকরীর ২০,০০০ টাকা জমা হয়েছিলো। তিনি সে টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। আবার তখন থেকেই রওশনের শরীর বেশ খারাপ হতে থাকলো। একদিন সকালে হঠাৎ দেখলেন তার বাম পা অবশ হয়ে গেছে, কিছুতেই নড়াচড়া করতে পারছেন না। গ্রামের ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তার জানালেন তার পক্ষাঘাত হয়েছে। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। শ্বশুরবাড়ী থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হলো তিনি যেন বাপের বাড়ী চলে যান। এরপর তাকে অনেকটা জোর করেই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

স্নেহময় বাবা সামান্য জায়গাজমি যা ছিলো তা বিক্রি করেই মেয়ের চিকিৎসা করালেন। ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত রওশন আরা অনুভব করলেন তাকেই সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জীবনযুদ্ধে হেরে যাবেন না তিনি, মের“দন্ড সোজা করে দাঁড়াবেন। আর পিছনে ফিরে দেখা নয়। মনে মনে শপথ নিলেন দু শিশু সন্তানকে মানুষ করবেন। এর মধ্যে তিনি খবর পেলেন স্বামী আব্দুর সাত্তার বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। স্বনির্ভর এর মাঠকর্মী ও আনসার ভিডিপির সদস্য থাকার সময় তার আচার-ব্যবহার গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই মুগ্ধ করেছিলো। সকলের প্রিয় হয়ে উঠছিলেন তিনি। এবার তিনি গ্রামবাসীর ইচছায় ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য পদের জন্য ভোটে দাঁড়ালেন। গ্রামবাসীই ভোটের সময় তার জন্য কাজ

করে দিলেন। সকলের আন্তরিকতায় ১৯৯৬ সালে তিনি ইউপি সদস্য নির্বাচিত হলেন। সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর রওশন আরা গ্রামের অবহেলিত নারীদের কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। গ্রামের নারীদের নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন 'পদাবিকা' নামের মহিলা সংগঠন।
ইউপি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণে তিনি নিলেন। রওশন আরা বিশেষ করে বললেন হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা যেটা নেয়ার পর নারী হিসাবে তার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে। সমাজকর্মের পাশাপাশি তিনি অর্থ উপার্জনের কাজে মনোযোগ দিলেন। স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সেলাই শিক্ষা-কোর্স সফলভাবে সমাপ্ত করেন। এ সময় তিনি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৪,৫০০ টাকা নিয়ে তার থেকে ২৫০০ টাকা দিয়ে একটি সেলাই কেনেন। বাকি টাকা বাড়ীর পাশে একটি দোকানে লগ্নি করেন। সেলাই মেশিন দিয়ে প্রথমে পরিচিতজনদের কাপড় সেলাই করতে শুরু করেন। সেখান থেকে একটা আয় হতে থাকে। বসত ভিটার পাশে ছোট্ট এক টুকরো জমিতে মাত্র ৩৮০ টাকার বীজ দিয়ে একটি নার্সারী গড়ে তোলেন। সে নার্সারী থেকে ঐ বছরই আয় হয় ৫০০০ টাকা। এ কাজের পাশাপাশি তিনি পোলট্রির প্রশিক্ষণও নিয়ে নেন। তারপর এক চিলতে জমিতে একটি দোচালা টিনের ঘর করে সেখানে পোলট্রি খামার গড়ে তুললেন। খামারটি প্রথমে খুব ছোট আকারেই দিয়েছিলেন। তারপর গ্রামের মানুষের আগ্রহ দেখে ধীরে ধীরে তা বেশ বড় করে তোলেন। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলেন পোলট্রি খামারে খুব দক্ষতা ও নিষ্ঠা ছাড়া এ শিল্পে লাভ করা সম্ভব হয় না। সার্বক্ষণিক দেখাশুনার প্রয়োজন হয়। খামার দেখার জন্য দু'জন মহিলাকে রাখলেন। খামারে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য তিনি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে 'সোলার সিস্টেম স্থাপন করেন। গ্রামের মানুষ অবাক বিস্ময়ে এই গ্রাম্য নারীর সৃজনশীলতা আর নতুন নতুন উদ্যোগ দেখতে থাকে।

গ্রামের বৃদ্ধ চা দোকানদার সোহরাব মিয়া মন্তব্য করেন, 'রওশনের মত উদ্যোগী নারী আমাদের এখানে আর একটিও নেই। রওশন গ্রামের চেহারাটাই বদলে দিয়েছে। পোলট্রি ফার্ম গ্রামের আশেপাশে আর নেই। আমরা খুব সস্তায় তার খামার থেকে ডিম পাই।' গ্রামের আরেক বৃদ্ধ তৈয়ব আলীর ভাষায়, 'আমরা তাকে খুব উৎসাহ দেই। নারী হয়েও সে অনেক কাজ করে।' রওশন আরা জানান তার সংগঠন 'পদাবিকায়' ২৫ জন সদস্য রয়েছেন। তাদের সবাইকে সেলাই হাঁস-মুরগী পালন ও নার্সারী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সবাই আয় করছেন। প্রত্যেকে মাসে গড়ে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা আয় করেন।

জীবন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত রওশন আরার উপলব্ধি, 'গ্রামের মেয়েদের অনেক দুঃখ। দুঃখী হইয়া বইয়া থাইকলে চইলত না। গ্রামের মাইগোরে শক্ত হইতে হইবো। নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবো। মেরুদণ্ড খাড়া থাইকলে সবাই সম্মান কইরবো।'

রওশন আরা মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়িয়েছেন। একজন সংগ্রামী নারী হিসাবে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। সফল আর আত্মবিশ্বাসী নারী হিসাবে তিনি নিজেও গৌরব বোধ করেন।

নোয়াখালি, ২০০৩